তুমি আমার চিরকালের

রাতুল চন্দ্ররায়

অন্ধকার তখনো দ্বিধায়। সে যেন ভুলেই গেছে যে কালের নির্দিষ্ট নিয়মে এ রঙ্গমঞ্চ থেকে তার প্রস্থানের সময় আসন্ন প্রায়। বিমূঢ়, হতবাক, স্থবির অন্ধকার একবুক অবিশ্বাস নিয়ে চলে যাবার আগে আরও একবার পিছন ফিরে তাকায়। চোখের কোনায় জল চিক্‌চিক্ করে ওঠে তার?

অন্ধকার যেখানে শেষ, সেইখানে একইভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুন একটা ভোর। তারও হৃদয় যেন দ্বিখণ্ডিত আজ— মহাকাল নিয়ন্তার নির্দেশে তারও তো আত্মপ্রকাশের সময় সমাগতপ্রায়। কিন্তু এ কোন বিষণ্ণ আঁধারে নিজেকে প্রকাশিত করবে সে! হা ঈশ্বর! আজও কি ভোর হ'তে আছে? একটা নিকষ কালো অন্ধকার আর একটা আলোকসম্ভাবী ভোর এইখানে মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়েছে। আর তাদের ঘিরে ছিন্নমূল উদ্‌ভ্রান্তের মতো একই আবর্তে উড়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত রাগ - রাগিনীর বুকখালি করা দীর্ঘশ্বাস— এই বিষণ্ণ আবছায়ায় তাদের কুয়াশা বলে ভ্রম হতে পারে। চরাচরে কোথাও কোনো শব্দ নেই। পৃথিবীর যাবতীয় নৈঃশব্দের প্রান্তসীমায় এসে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা হাহাকার —মিঞা তানসেন আর নেই।

প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে অট্টালিকার খোলা ছাদে, খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালেন বিলাসখান— সেইখানে, যেখানে থমকে আছে ভোর। তাঁরও গলার কাছে থমকে আছে একটা প্লাবনগর্ভ কান্না। কিন্তু তারও যেন আজ শব্দ হতে মন চাইছে না। আজ কোনো বেসুরো আওয়াজ নয়, প্রিয়তম পিতা, প্রাণাধিক গুরুর বিদায়ী ইরশাদে অন্ততঃ সুরের বিচ্যুতি যেন না ঘটে— এই ভাবনায় নিজের হৃদয়কে তিনি শাসন করেছেন প্রাণপণ। না, বিলাসখান একা নন, না ফোটা কুঁড়ি, থমকে যাওয়া ভোর, বিদায় বলতে না চাওয়া অন্ধকার, চরাচরব্যাপী নৈঃশব্দ— সবাই, সব্বাই মিলে ঐ কুয়াশার বালিশে মুখ গুঁজে কান্না চেপে চলেছে। ক্রমশঃ সেই চাপা কান্না তানপুরার বিষণ্ণ গোঙানির মতো বেজে ওঠে। দৈবনির্দেশিতের মতো নতজানু বিলাসখান তাঁর আব্বা, তাঁর আঁখরী সালাম জানাতেই যেন এতক্ষণ ধরে জমিয়ে রাখা বিষাদের শেষ বিন্দুটুকু উজাড় করে দিলেন ষড়জে। তারপর ক্রমশঃ কোমল রেখাব... আরও কোমলগান্ধার...কিন্তু কী হল আজ বিলাসখানের? তাঁর কণ্ঠ আজ তাঁর প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষার শাসন না মেনে এ কোন নতুন নতুন পথে চলেছে— কাকে খুঁজে চলেছে আপ্রাণ? তাঁর অজান্তেই তাঁর হৃদয়ের থেকে উৎসারিত এ কোন নতুন সুর - প্রবাহ হাহাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই আলো - আধারির সীমারেখায়? জানেন না বিলাসখানা - দু চোখ বুঁজে তিনি শুধু তাঁর বিষাদের তর্জমা করে চলেছে, তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত কান্নাটুকু কেঁদে চলেছেন। সে কান্না এক সদ্যোজাত শিশুর। একটি সদ্যোজাত ভোর সাক্ষী —সেদিন সেই মুহূর্তে বিষাদের সূতিকাগৃহে জন্মে নিয়ে প্রথমবার কেঁদে উঠেছিল— রাগ বিলাসখানানি টোড়ি।

জনৈক প্রাজ্ঞের মুখে শোনা এ লোকশ্রুতির কতটা সত্যি, কতটা কল্পনা কে জানে, কিন্তু ঊষারম্ভের মায়াবী না - আলো না - অন্ধকারে বিলাসখানি টোড়ি তার অকৃপণ দুই হাতে, পুবের আকাশে যে অপার্থিব আলো ছায়া, তার মর্মকথাটি যে নির্ভেজাল বিষাদে — তা উপলব্ধি করার জন্য বাদী, সম্বাদী, কড়ি, কোমল কিচ্ছু জানার প্রয়োজন হয় না। নিতে হয় না কোনো কল্পনার আশ্রয়। ভোরের প্রথম আলো যে ঘড়ির কাঁটার তোয়াক্কা না করেই একটু একটু করে অন্ধ পৃথিবীকে চক্ষুষ্মান করে তোলে, ঠিক সেইভাবে এই সংক্রামক সুরও শ্রোতার পাণ্ডিত্য বা অজ্ঞতার ধার ধারে না, নিজগুণে সবরকম অজ্ঞতার বাধা অতিক্রম করে পৌঁছে যায় হৃদয়ের খাসমহলে— সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জাগিয়ে তোলে ঘুমিয়ে থাকা বিষাদকে। আর বিষাদের পরিভাষা — সে তো জ্ঞানীর কাছেও যা, বিজ্ঞানীর কাছেও তাই, আর আমার মতো নিতান্ত অজ্ঞানতিমিরান্ধের কাছেও একই। অনেক বছর আগের কথা, কত সার ঠিক মনেও নেই। রেডিওতে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একটি গান প্রথমবার শুনে অদ্ভুত মন খারাপ হয়েছিল। প্রথমবারের শ্রুতিতে সে গানের বাণী অনুসরণ করবার মতো যথেষ্ট মনঃসংযোগ না থাকলেও সুরটা লক্ষ্যভেদ করেছিল হৃদয়ের গভীরে, আর তারপর বেশ কিছু দিন সেই বিষাদের স্বরলিপি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর বহুবার সে গান শুনেছি। যদিও আরও অজস্র গানের ক্ষেত্রে, অসংখ্য সুরের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিষাদ - অভিজ্ঞতা এর আগে পরে বহুবার হয়েছে। তবু বিশেষ করে এখানে এই গানটির উল্লেখ যে করলাম, তার একটা কারণ আছে। বাণী ভুলে যাওয়া সেই সুরের তাড়া খেতে খেতে, সেই সুর থেকে উৎসারিত বিষণ্ণতায় ভিজে যেতে যেতে, তাকে চিনতে চেয়ে জানতে পারলাম এ সুর বিলাসখানি টোড়ির। লেখার শুরুতে বিলাসখানি টোড়ির জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কিত যে কাহিনিটির অবতারণা করেছিলাম, সে গল্প শুনেছিলাম এর অনেক বছর পর। ইতোমধ্যে আরও অনেক গান, আরও অনেক স্মৃতির তলায় যে গানটি কোথায় চাপা পড়ে ছিল— কে জানে। কিন্তু ঐ গল্পটি বিদ্যুৎ চমকের মতো তাকে অবচেতনের অতল থেকে তুলে এনে হাজির করল চেতনার সিংহ - দুয়ারে। আশ্চর্য! ঠিক যেন গল্পটির আবহসঙ্গীত হয়ে আমার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল 'তোমাকে না নিয়ে যেন আসে না সকাল/ তার চেয়ে আছে রাত থাক রাত চিরকাল' — কে মেলায় এমনভাবে? সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শোনা একটা হারিয়ে ফেলা গানকে একটা তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার পটভূমিতে এমন নিপুণভাবে খুঁজে এনে জুড়ে দিলো কে? তবে কি সে-ই আমার বিষাদ, যে যখের ধরেন মতো করে গানটিকে আগলে রেখেছিল যথা সময়ে সুদে - মূলে ফেরৎ দেবে বলে? এ তো কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয় — এ অভিজ্ঞতা তো হামেশাই ঘটে! শক্তিশালী চুম্বক যেমন অনেক অচৌম্বক পদার্থের ভীড়ে চাপা পড়ে থাকা লোহার টুকরোকে সুনিপুণ ভাবে আকর্ষণ করে কাছে টেনে আলিঙ্গন করে, সেভাবে হঠাৎ কোনো গান স্মৃতির অতল থেকে কোনো আপাত বিস্মৃত ঘটনাকে পলকপাতে খুঁজে বের করে তাকে বুকে টেনে নেয়, বলে —'বন্ধু, কী খবর বল্, কতদিন দেখা হয়নি!' খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই মিলিয়ে দেবার সৃষ্টিছাড়া খেলায় সুখস্মৃতির থেকে বিষাদের স্মৃতিই ফিরে আসে বেশি। আসলে সুখ তো তার মতো করে স্বয়ংসম্পূর্ণ —বিষাদ চির অতৃপ্ত, চির অভাবী। তার সেই অভাববোধগুলো, সেই অসম্পূর্ণ টুকরোগুলো তাই নিরন্তর খুঁজে চলে তার পরিপূরককে। কিন্তু 'এ কেবল দিনে রাত্রে/ জল ঢেলে ফুটাপাত্রে/ বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবারে'—বিষাদের না আছে শুরু, না আছে শেষ— ফলে তার তৃষ্ণাই আছে শুধু— তৃপ্তি নেই। সন্ধান আছে, সমাধান নেই। এই সন্ধানেই বোধ হয় সুরের সঙ্গে বিষাদের আত্মীয়তা। সুরও তো আসলে এক অনন্ত সন্ধান! ভৈঁরোর কোমল রেখার আর কোমল ধৈবত ভোরের প্রথম আলোটির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা গত রাত্রের বিদায়চন্ত্রণাকে যেন ক্রমাগত খুঁজে চলে। পরজে সেই কোমল রেখার, সেই কোমল বৈধত কারো রাত জাগা দু-চোখে দীর্ঘ নিশিযাপনের শেষ প্রহরের অবসাদকে প্রাণপণে সন্ধান করে ফেরে। সূর্যস্তের ঠিক আগে আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়াতে পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে বৈরাগ্যের উদাসীন রাতুল আভা 'বিদায়' 'বিদায়' বলতে বলতে ঠোঁটের কোনায় যে বিষণ্ণ হাসিটি হাসে, তার তর্জমা করতে ঐ যে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে— ওর নাম মারোয়া। রোদের সুদীর্ঘ শাসন শেষে কোমল রেখাবের সুশীতল

আশ্রয়ে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেউ— আর সেই দীর্ঘশ্বাসের ব্যঞ্জনার খোঁজে মন্দ্র আর মধ্যসপ্তক জুড়ে তল্লাশি চালায় শ্রী। দিন আর রাতের মাঝে স্বপ্লায়ু গোধূলি — সে দিনেরও নয়, রাতেরও নয়— সে স্বতন্ত্র, একা। তার একাকিত্বের বিষণ্ণ আলো - আঁধারিকে মৃদু আলোকবর্তিকা হাতে অচঞ্চল পায়ে খুঁজতে বেরিয়েছে— ও কে? পূর্বী না? এভাবেই স্বর থেকে স্বরে, কোমলে, কড়িতে, মন্দ্র থেকে মধ্যে, মধ্যে থেকে তারে, ঊষা থেকে গোধূলি পর্যন্ত এক অন্তহীন খোঁজ, এক অনন্ত অনুসন্ধিৎসা। আর সেই অনুসন্ধিৎসাই বোধ হয় সুরের সঙ্গে বিষাদকে একাত্ম করে তোলে। কারণ বিষাদ অরূপ, অনির্বচনীয় — আর যা কিছু অনির্বচনীয় তাকে বহন করে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই তো সুরের কাজ! সেই অরূপে রূপদান করতেই সুরের অক্লান্ত সন্ধান— সে সন্ধানের প্রতিটি পদচিহ্নে নতুন নতুন সৃষ্টির বীজ... নতুন আশা... নতুন সম্ভাবনা...

এখানে কবিগুরুর কাছে একটু ঋণী হবার লোভ না হয় না- ই বা সামলালাম : '...ভোরবেলাকার আকাশে হাওয়া এমন কিছু একটা আছে যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ - অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্বচনীয়। যাহা নির্বচনীয় তাহা পৃথক, তাহা আপনাতে আপনি সুনির্দিষ্ট। যেখানে পদ্মফুলের নির্বচনীয়তা সেখানে আর আকার আয়তন ও বস্তু পরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশি। এই বেশিটুকুই তার সংগীত।' ঐ বেশিটুকুকে খঁজে পেতেই যেন একটি স্বর পথ চলা শুরু করে। খুঁজে পায় অন্য একটি স্বরকে। তার অনুসন্ধিৎসা সঞ্চারিত হয় নতুন স্বরটিতে, তার হাতঘুরে আবার অন্য কোনো স্বরে... এইভাবে বিভিন্ন পথে, বিভিন্নভাগে গান আসলে সেই অনির্বচনীয়কেই খোঁজে ফেরে, আখতারীবাঈ যার জন্য বিস্তারে বিস্তারে খুঁজেছিলেন সেই আদা, —কীভাবে বললে পিয়া অভিমান ভুলবে, কিংবা যার পথ চেয়ে রবিঠাকুরের গান আপন হৃদয় গহন - দ্বারে কান পেতে থাকে কোনো গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথাটিকে চিনে নিতে— সেই তো বিষাদ! সেই - ই তো সুর-বাউলের সেই মনের মানুষ। যে অরূপ কাঁটা সোনাকে সে রূপসাগরে দেখতে পায়— কিন্তু ধরতে গেলেই সে হারিয়ে যায়। না, ঠিক হারিয়ে যাওয়া নয়, যেন হারিয়ে ফেলা। এ যেন হারিয়ে ফেলে আবার খোঁজার নিরবধি খেলা — 'তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ/ ও মোর ভালোবাসার ধন।' যতই হারিয়ে ফেলে, গানের পিপাসা তত বাড়ে, ততই সুর নতুন উদ্যমে নতুন নতুন পথে অবার সেই দশদিকে নিজেকে ছড়াতে ছড়াতে, বাড়াতে বাড়াতে কখন যেন নিজেও অসীন হয়ে ওঠে, বলে : 'তুনি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালেক।' বিষাদের সঙ্গে সেই চিরকালীন শাশ্বত সংযোগটিকে যেন ধর্মের মতো বহন করে চলে সঙ্গীত। এ সংযোগ অনেকটা ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যোগের মতো। এক একটি গান যেন এক একটি দেবালয় গানের বাণী যেন দেবালয়ের ঘন্টা, আর এক একটি স্বর যেন এক একটি উপচার সাজিয়ে অপেক্ষা করে দেবতার— কেউ ধূপ, কেউ দীপ, কেউ ফুল, কেউ চন্দন... আর কোমল রেখার— সে যেন বিষাদের সিংহাসন। অনাদি- অনন্ত বিষাদ ঐ কোমল রেখাব— সে যেন বিষাদের সিংহাসন। অনাদি অনন্ত বিষাদ ঐ কোমল রেখাবেই এতে অধিষ্ঠিত হন। আর কোমল ধৈবত যেন সিংহাসনাসীন বিষাদের চরণাধার— যেখানে তাঁর পদচিহ্ন মূর্ত হয়ে ওঠে। এই অর্বাচীনের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। এ শুধুমাত্র আমার শ্রবণ - অভিজ্ঞতা, আমার বিষাদ - অভিজ্ঞতা— যা একান্তভাবে আমার, আমারই। কেউ একমত হ'ন বা না হ'ন আমার আর আমার বিষাদের মাঝখানে যে স্পর্শকাতর সেতুটি — তার দুই প্রান্তের ধারক স্তম্ভদুটি হল ঐ কোমল রেখাব আর কোমল ধৈবত। গম্ভীর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই হোক, বা লঘু সঙ্গীত, উদাসী বাউলের ভোরাই - ই হোক বা নিঃসঙ্গ মাঝির ভাটিয়ালী, গালিবের গজন -ই হোক বা মীরার ভজন, স্বর্ণযুগের গানই হোক বা হাল আমলের জীবনমুখী —যখনই যতবার তাতে কোমল রেকাব ধৈবত এসে দাঁড়িয়েছে তখনই, ততবার সেই গানের অবগুণ্ঠন সরিয়ে উঁকি দিয়ে গেছে বিষাদ। সঙ্গীতে যাঁদের পাণ্ডিত্য, হয়তো তাঁরা অবহেলায় সহস্রাধিক উদারহণ সহযোগে আমাকে ভুল প্রমাণ করতে পারবে। আমিই যথার্থ — এমন দাবীও আমার নেই। তবু আমার অনুভূতিকে অস্বীকার করি কী করে— 'সত্য হোক মিথ্যে হোক, সে বড়ো সুন্দর'! তার চেয়ে বরং সঙ্গীত - অজ্ঞ এই গানপাগলের বিষাদমণ্ডলে কোমল রেখাব আর কোমল ধৈবতের প্রতি এই সামান্য পক্ষপাত নিজগুনে ক্ষমা করে দিন।

প্রাজ্ঞজনের মার্জনা, বা সস্নেহ প্রশ্রয় কিংবা তিরস্কার শিরোধার্য করে আবার প্রসঙ্গে আসা যাক। বিশেষ বিশেষ সুর বা গান যেমন বিষাদ সঞ্চারিত করে, তেমন কোনো বিষণ্ণ অভিজ্ঞতা কোনো সুর বা গানের অংশ হয়ে যায়। যে মানুষ ভালোবেসে গান শোনো, তার অজান্তেই গান কখন যেন তার জীবনের দিনলিপি হয়ে যায়— স্মৃতির অংশ হয়ে যায়। সে যেন মৌসুমী বায়ু। পলকপাতে সে আমার যোজন দূরের বিষাদসিন্ধু থেকে বিষাদবাষ্প উড়িয়ে এনে আমার রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে দিতে পারে। হতেই পারে যে গানের শ্রবণানুভূতি আদৌ বিষাদের নয়— আনন্দের। অথচ সে গান এমন কোনো স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যায় যে শ্রবণাত্র জীবন - দিনলিপির বহু পুরনো একটা পৃষ্ঠা হঠাৎই চোখের সামনে খুলে যায়। সীমিত সময়ের সুখের স্মারক কোনো কোনো গান এভাবেই পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বিষাদের বন্ধ ঘরের চাবি হয়ে রয়ে যায়। শুরুর গল্পটা ছিল এক হতভাগ্য পুত্রের পিতৃবিয়োগের যন্ত্রণার লোকশ্রুতি। আর এ ঘটনা এক হতভাগ্য পিতার সন্তান বিয়োগের কথা। সে পিতৃত্বের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র সাড়ে তিন মাস। কিন্তু তার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আনন্দময়, সুখপ্রদ। নিম্নমধ্যবিত্ত পিতাটি সীমিত সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে ভালোবেসেছিল সন্তানকে, আর দিয়েছিল গান, রোজ ঘুমের সময় হলে সে হতভাগা সন্তানকে কোলে নিয়ে গান শোনাত — বলাবাহুল্য, সে গানের কোনোটিই আদৌ বিষাদবহ ছিল না। শিশুটি সে সব গানের কী বুঝত কে জানে তবে সুরের আবেশই হোক বা ঘুমের— সে ঘুমিয়ে পড়ত। নতুন অতিথির আতিথেয়তায় জ্ঞানত সে কোনো ত্রুটিই রাখেনি। তবু কোন অভিমানে অতিথি তার আতিথ্য ত্যাগ করে চলে গেল, সে উত্তর আজও তার অজানা। শেষবারের মতো সে তার চিরনিদ্রিত সন্তানের কপালে চুমু দিয়ে মনে মনে গেয়ে উঠেছিল : 'যাওরে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি—/দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।' তারপর বিষণ্ণ চাঁদের আলোয়, তাকে রেখে এসেছিল মাটির নরম কোলে। হতভাগ্য পিতার কাছে রয়ে গেল কিছু ঘুমপাড়ানি গান — তার বাকি জীবনের এক দুর্গম বিষাদঘরের চাবি হয়ে

এখন অনেক রাত। চরাচরব্যাপী বিষণ্ণ চাঁদের আলোয় ভীড় করেছে সেইসব ঘুমপাড়ানি গানের বুকখালি করা দীর্ঘশ্বাস এই বিষণ্ণ আলোয় তাদের কুয়াশা বলে ভ্রম হতে পারে। দু - চোখে এখন দীর্ঘ নিশিযাপনের শেষ প্রহরের অবসাদ। তন্দ্রার মতো কোনো গম্ভীর তারযন্ত্রে বেজে ওঠে পরজের সুর । তার কোমল রেখাব আর কোমল বৈধত পশ্চিম আকাশে দুটি তারা হয়ে লক্ষ্য করে হতভাগ্য পিতাকে — তারা নয়, যেন তার হারানো সন্তানের দুটি কোমল চোখ ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে চায়, ঘুমে দু-চোখ বুজে আসছে তার। সন্তানের চোখ ... কোমল রেখাব... কোমল বৈধত... পরজ...ঘুমপাড়ানি গান... সব একাকার হয়ে যায় বিষণ্ণ চন্দ্রালোকে ভিজে যাওয়া কুয়াশায়। সে এখন একটু ঘুমোতে চায়...এবার কলম বন্ধ করার অনুমতি দিন তাকে।